Islamiboi.tk

সূরা আল হুমাযাহ

আয়াত ৯ রুকু ১

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿১﴾ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿২﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ
اَخْلَدَهٗ ۚ﴿৩﴾ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ﴿৪﴾ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ﴿৫﴾ نَارُ
اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿৬﴾ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ﴿৭﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿৮﴾
فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿৯﴾

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. দুর্ভোগ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে (সামনে পেছনে মানুষদের) নিন্দা করে, ২. যে (কাঁড়ি কাঁড়ি) অর্থ জমা করে এবং (যথাযথভাবে) তা গুনে গুনে রাখে, ৩. সে মনে করে, (তার এ) অর্থ তাকে (এ দুনিয়ায়) স্থায়ী করে রাখবে, ৪. বরং নির্ঘাত অল্পদিনের মধ্যেই সে চূর্ণবিচূর্ণকারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে, ৫. তুমি কি জানো, বিচূর্ণকারী আগুন কেমন? ৬. (এ হচ্ছে সম্পদলোভীদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার প্রজ্বলিত এক আগুন, ৭. যা (এতো মারাত্মক যে,) মানুষের হৃদয়ের ওপর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; ৮. (গর্ত বন্ধ করে) তাদের ওপর ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে, ৯. (যেন খুলে না যায় সে জন্যে) উঁচু উঁচু থাম দিয়ে (তা গেড়ে) রাখা হবে।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক যুগের পরিস্থিতির একটি বাস্তব দিক এই সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। আসলে প্রত্যেক সমাজের পরিবেশেই এ ধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। এক ধরনের সংকীর্ণমনা ছোট লোক অনেক সমাজেই দেখা যায়। তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে নিজের প্রতিপত্তি জমাতে চেষ্টা করে। এ জন্য সে যত নিচে নামা সম্ভব নামে। তারা ভাবে, সম্পদই হলো জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পুঁজি। এর চেয়ে আর কোনো মূল্যবান জিনিস নেই। মানবিক, নৈতিক কিংবা সামাজিক মূল্যবোধ সবই অর্থ-সম্পদের সামনে হেয় ও গৌণ। তারা মনে করে, অর্থের মালিক হতে পারলেই সকল মানুষের মান-মর্যাদা ও মূল্যবোধ বিনা হিসাবে তার করতলগত হবে।

তাফসীর

অর্থ-সম্পদকে এই শ্রেণীর মানুষ সর্বশক্তিমান খোদা বলে মনে করে। কোনো কিছুই তার অসাধ্য নয়। আর যদি তার দৃষ্টিতে কোনো হিসাব-নিকাশ ও কর্মফলের অবকাশ থেকেও থাকে, তবু সে টাকাকড়ি দিয়ে তারও গতিরোধ করতে পারবে বলে মনে করে। এ জন্য অর্থ লোলুপতায়

যিলাল ২২তম ১৯ (খ)

Islamiboi.tk

তারা গতিসীমার বাধ মানে না। টাকাকে সে অনবরত গুণে আনন্দ পায়। এর পাশাপাশি তার ভেতরে এক ধরনের পাপাসক্ত ও অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তি বিকাশ লাভ করতে থাকে। এই মনোবৃত্তি তাকে মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে পদদলিত করা, পরনিন্দা করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করা, মুখে কুৎসা রটানো, অংগভংগি দ্বারা উপহাস করা, কথায় ও ইংগিতে ব্যাংগ করা অথবা তাদের উপাধি ও প্রতীকগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, ইত্যকার অপতৎপরতায় প্ররোচিত করে।

এটা মানব চরিত্রের একটা ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট রূপ। মানবতা, ভদ্রতা, সৌজন্য ও ঈমান বিবর্জিত হলেই মানুষের ভেতরে এহেন নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য চালচলন দেখা দেয়। ইসলাম এ ধরনের নিচু মানের মানসিকতাকে ঘৃণা করে। কেননা উন্নত নৈতিকতা তার ভূষণ। সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কটাক্ষপাত, পরনিন্দা ও কুৎসা রটনাকে একাধিকবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে এ সূরায় যেভাবে অতিমাত্রায়, ঘৃণা ও ধিক্কারের সাথে হুমকি ও ধমক দিয়ে এ সবের উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মোশরেকদের পক্ষ থেকে রসুল (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে এ ধরনের একটি বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছিলো, যার জবাবে এখানে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিছু কিছু রেওয়ায়াতে কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেসব রেওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য নয়। ওই সব রেওয়ায়াতের মধ্য থেকে যেটুকু আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করেছি, তার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকছি।

পুজিপতিদের জন্যে সাবধান বাণী

এতে যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে, তা কেয়ামতের একটি দৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে করা হয়েছে। এতে রয়েছে নির্যাতনের দৈহিক ও মানসিক রূপ এবং আগুনের বাস্তব ও রূপক দৃশ্য। এখানে অপরাধ এবং তার শক্তি দানের পদ্ধতির মধ্যে একটা তুলনা লক্ষণীয়। কথায় ও ইংগিতে নিন্দা ও কটাক্ষকারীর বর্ণনা এরূপ দেয়া হয়েছে যে, মানুষের সাথে ব্যাংগ বিদ্রূপ করা ও তাদের ইযযত-সম্ভ্রব নিয়ে কটূক্তি ও কু-ইংগিত করা তার সার্বক্ষণিক অভ্যাস ও রীতিতে পরিণত হয়। সে অর্থ-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে আর ভাবে যে, ওটা তার জীবন ও সুখ-সম্ভোগের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। একদিকে এই অর্থদর্পী উপহাসকারী প্রতাপশালী ব্যক্তির দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, অপরদিকে সেই হতভাগা ব্যক্তির দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে, যাকে শোচনীয় অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও তাচ্ছিল্যের 'হুতামায়' নিক্ষেপ করা হবে। আর 'হুতামা' এমন জায়গা, সেখানে যা-ই নিক্ষিপ্ত হয়, তাই ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানেই এই প্রতাপশালী পাপাচারী ব্যক্তিটিরও সকল দর্প, অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে। হুতামা হলো 'আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন।' আগুনকে এভাবে 'আল্লাহর আগুন' বলে সম্বন্ধযুক্ত করা থেকে বুঝা যায় যে, এটা একটা নযীরবিহীন, অসাধারণ ও অকল্পনীয় ভীতিপ্রদ আগুন হবে। যে হৃদয় থেকে মোমেনদের প্রতি ব্যাংগ-বিদ্রূপের ইচ্ছা জাগে, এই আগুন সেই হৃদয়ের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে। ঠাট্টা-তামাশা করার বাসনা ও অহংকারের জন্মস্থানরূপী অন্তকরণকেও তা দগ্ধ করবে। শুধু চরম অবমাননা ও তাচ্ছিল্যের সাথে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকা হবে না, বরং এই আগুনকে তার ওপর আবদ্ধ করে দেয়া হবে, যাতে কেউ তাকে উদ্ধার করতে না পারে এবং সেও কাউকে কোনো অনুরোধ করতে না পারে। গরু, গাধা ইত্যাদিকে যেমন রশি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়, তাকেও তেমনি বেঁধে রাখা হবে। সূরাটিতে একধিক শব্দে 'তাসদীদ' প্রয়োগ দ্বারা আযাবের কঠোরতা ও নির্মমতাকে অধিকতর ব্যাগময় করা হয়েছে। আর একাধিক

Islamiboi.tk

'তাকীদ' সূচক পদ ব্যবহার করে এই আযাবের অবধারিত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া বুঝানো হয়েছে। প্রথমে সংক্ষেপে ও অস্পষ্টভাবে বর্ণনা দান, তারপর ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণ ও ভীতিপ্রদ করে তুলে ধরার জন্য প্রশ্ন করা, তারপর জবাব দিয়ে ব্যাখ্যা দান,–এ সব কিছু মিলে এই আযাবকে অতি মাত্রায় ভয়ংকর, আতংকজনক ও অবধারিত রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। 'ওয়ায়লুন (সর্বনাশ বা ধ্বংস) 'অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে' 'হুতামা', 'আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন' যা হৃদয় পর্যন্ত ঢুকে যাবে, তা তাদের ওপর আবদ্ধ থাকবে, খুঁটির সাথে বাঁধা থাকবে' এ সব উক্তির মধ্যে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর সার্বিকভাবে এ সূরায় এক ধরনের শৈল্পিক ও চেতনাগত সমন্বয় রয়েছে, যা 'ব্যংগ-বিদ্রূপ ও কটাক্ষকারী'দের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোরআন নাযিল হওয়ার সময়ে একদিকে যেমন সে ইসলামের দাওয়াতের নেতৃত্ব দিতো, অপরদিকে তেমনি দাওয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকেও পর্যবেক্ষণ করতো। কোরআন ছিলো একাধারে ধারালো অস্ত্র এবং কুচক্রীদের চক্রান্ত নস্যাত করার বজ্রনিনাদিত হুংকার। এই হুংকারে সে শত্রুদের হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিতো, আর মোমেনদের হৃদয়কে প্রশান্ত করতো ও প্রবোধ দিতো।

এ সূরায় যে ভংগিতে আল্লাহ তায়ালা প্রতিবাদ করেছেন ও জবাব দিয়েছেন তাতে আমরা দুটি তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি।

প্রথমত নৈতিক অধপতনের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার দান এবং এই নিচ মানসিকতার নিন্দা।

দ্বিতীয়ত মোমেনদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দান এবং তাদের মনে যাতে অপমানবোধ প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আর সেই সাথে তাদেরকে এ কথা উপলব্ধি করানো যে, তাদের সাথে যা কিছু আচরণ সংঘটিত হচ্ছে, তা তিনি দেখেছেন, অপছন্দ করছেন এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এর মাধ্যমে এই মর্মেও ইংগিত দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের আত্মাকে এ সব হীনমনাসুলভ চক্রান্তের অনেক উর্ধে রাখবেন।

Islamiboi.tk

সূরা ফীলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সূরা ফীলে আখেরী নবী মোহাম্মদ (স.)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পূর্বে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র আরব ভূখন্ডকে তাঁর সর্বশেষ সুমহান জ্যোতিকে উদ্ভাসিত করার জন্য পূর্বাহ্নেই নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। এ ঘটনা থেকে আরো ইংগিত পাওয়া যায় যে, আরব ভূখন্ড থেকেই বিশ্বব্যাপী হেদায়াতের আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং জাহেলিয়াতের মুলৎপাটন করে সত্য কল্যাণের প্রভায় স্নাত হবে গোটা বিশ্ব-নিখিল।

আসহাবে ফীলের ঘটনা

বিভিন্ন রেওয়ায়াতের মাধ্যমে জানা যায় যে, ইয়েমেনে পারস্য শাসনের অবসানের পর আবরাহা নামক একজন ইথিওপিয়ান (হাবশী) শাষন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

আবরাহা ইয়েমেনে ইথিওপিয়ান শাসকের নামে স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ এক সুবিশাল গীর্জা নির্মাণ করে। তার উদ্দেশ্য ছিলো যে, মক্কার পবিত্র বায়তুল্লাহর পরিবর্তে আরবসহ সকল দেশের অধিবাসীরা যেন এ গীর্জাকেই যেয়ারতের কেন্দ্র হিসাবে গ্রহণ করে এবং তীর্থস্থান হিসাবে সবাই যেন এখানেই আসে সে আরো আশা করেছিলো যে, এ গীর্জা সমগ্র আরবের কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের কারণে আরব উপদ্বীপের প্রধান তীর্থকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। আর উত্তর ও দক্ষিণের সকল অধিবাসীরাই দলে দলে এখানে ছুটে আসুক। রাজার কাছে তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনুমোদন কামনা করে সে একটি চিঠিও পাঠায়। কিন্তু আরবদের দৃষ্টি পবিত্র বায়তুল্লাহকে পরিত্যাগ করে তার নবনির্মিত গীর্জার প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হলো না।

আরবরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরসূরী হিসাবে দাবী করতো। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)-এর নির্মিত বায়তুল্লাহকে পবিত্র ঘর হিসাবে এর মর্যাদা ও সম্মানের সংরক্ষণ এবং এর ঐতিহ্যকে ধরে রাখাকে নিজেদের জন্য অত্যন্ত গৌরবজনক বলে মনে করতো। তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের তীর্থভূমির চেয়ে ইবরাহিম ও ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর হওয়া ও তাদের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল্লাহর সুউচ্চ গৌরব ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখাকে তাদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করতো। বায়তুল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া বা এর পতন ও বিপর্যয় সাধনের চিন্তা তাদের কাছে ছিলো অকল্পনীয়। তারা সকল আহলে কেতাবের চেয়ে কাবার রক্ষক ও তার প্রতিবেশী হিসাবে নিজেদেরকে অধিক সম্মানের অধিকারী মনে করতো।

এমতাবস্থায় আবরাহা তার নির্মিত গীর্জার গুরুত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি না পেয়ে কাবাঘরের ধ্বংস সাধন, একে ধূলিস্মাৎ করা ও কাবা থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আবরাহা তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে কাবাঘর ধ্বংসের অভিযানে রওয়ানা হলো। আবরাহা রওয়ানা দেয়ার পরআরবরা এ সংবাদ শুনেও ফেললো। 'যুনফর' নামক এক অভিজাত ইয়েমেনী নেতা আবরাহার এ অভিযান প্রতিরোধ ও বায়তুল্লাহর ধ্বংস থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য তার নিজের গোত্র ও বিভিন্ন গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আবরাহার সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু যুদ্ধে যুনফর ও তার বাহিনী আবরাহার মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করে ও যুনফর আবরাহার হাতে বন্দী হয়।

এরপর পথিমধ্যে আরবের দুটি প্রসিদ্ধ গোত্র ও বিপুল সংখ্যক আরবদেরকে সাথে নিয়ে নুফাইল ইবনে হাবীব আল খাসয়ামী আবরাহার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলে এ বাহিনীও পরাজিত হয়

Islamiboi.tk

এবং নুফাইল বন্দী হয়। এমনিভাবে এ সকল খন্ডযুদ্ধে আবরাহার বিজয়ের কারণে আরবদের মনে আরো আতংক সৃষ্টি হয়।

অতপর আবরাহা বাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী সাকীফ গোত্রের এলাকায় এলে বনু সাকীফ তাদের দেবতা 'লাত'-এর জন্য নির্মিত মন্দিরকে তাদের হাত থেকে হেফাযতের জন্যে আবরাহা বাহিনীকে সহযোগীতা করলো। বনু সাকীফের নেতা আবরাহা বাহিনীকে মক্কার পথ প্রদর্শনের জন্য তার গোত্র থেকে একজন রাহবারও তাদের সাথে দিয়ে দেয়।

একজন মোশরেকের ঈমানী দৃঢ়তা!

আবরাহা অগ্রসর হয়ে তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান মুগাম্মাসে অবস্থানকালীন 'তেহামা' ও 'কোরায়শ'সহ বিভিন্ন' গোত্রের কয়েকশত গৃহপালিত পশু চারণভূমি থেকে নিয়ে যায়। এই পশুসমূহের মধ্যে আবদুল মোত্তালেব ও বনু হাশেমের দু'শত উটও ছিলো। আবদুল মোত্তালেব ছিলেন কোরায়শদের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও গোত্রপতি।

কোরায়শ, কেনানা ও হুযায়ল গোত্রের লোকেরা প্রথমত আবরাহা বাহিনীর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এতো বড়ো বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত হতে হবে মনে করে তারা তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।(১)

মক্কায় প্রবেশ করে অবরাহা এ মর্মে দূত পাঠায় যে, সে শুধু কাবা ঘর ধ্বংসের জন্যই এসেছে, যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। সে মক্কাবাসীকে এটাও জানাতে চায় যে, কাবার প্রতিরক্ষার জন্যে যদি মক্কাবাসী মোকাবেলায় লিপ্ত না হয়; তাহলে রক্তপাতের কোনো ইচ্ছা তার নেই। আবদুল মোত্তালেব আবরাহার দূতের সাথে আলোচনার পর তাকে জানান যে, আল্লাহর কসম, আবরাহার সাথে যুদ্ধের কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই, তার সাথে যুদ্ধ করার শক্তিসামর্থও আমাদের নেই। এটি আল্লাহর পবিত্র ঘর ও ইবরাহীম (আ.)-এর নির্মিত। আল্লাহই এর রক্ষাকর্তা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঘরকে রক্ষা করতে চাইলে তিনিই তা রক্ষা করবেন। আর যদি তিনি তাঁর ঘরকে রক্ষা না করেন, তবে আল্লাহর কসম, অন্যথায় প্রতিরোধের কোনো শক্তিই আমাদের নেই। আবরাহার দূতের সাথে আলোচনার পর আবদুল মোত্তালেব নিজেও আবরাহার কাছে যান।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আবদুল মোত্তালেব তৎকালীন সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন ও সুঠাম দেহের অধিকারী। আবরাহা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এমনকি তাকে নিচে বসিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে থাকাও সমীচীন মনে করলো না। আবরাহা আবদুল মোত্তালেবের সম্মানে সিংহাসন থেকে নেমে বিছানায় বসে পড়লো এবং আবদুল মোত্তালেবকে তার পাশেই বসালো।

তারপর আবরাহা তার দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলো, কোরায়শ সরদার আবদুল মোত্তালেবের আগমনের উদ্দেশ্য কী? আবদুল মোত্তালেব বললেন, আমার উট ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। আবদুল মোত্তালেবের কথা শুনে আবরাহা বললো, হে কোরায়শ নেতা। আমি আপনাকে দেখে প্রথম মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আপনাকে খুবই প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি বলেই ধারণা করেছিলাম, কিন্তু আপনার কথা আমার সমস্ত ধারণাকেই পাল্টে

---

(১) বিভিন্ন তাফসীর থেকে জানা যায় যে, আবরাহা বাহিনীতে ৬০ হাজার সৈন্য ও ১৩টি হস্তি ছিলো।—সম্পাদক

Islamiboi.tk

দলো। আপনি আপনার উটের প্রসংগটাই আমার কাছে উত্থাপন করলেন, অথচ আপনি ও আপনার পূর্ব পুরুষদের সম্মানিত ঘর ও আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাণকেন্দ্র কাবাঘরের প্রসংগটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন! যে ঘর ধ্বংস করার জন্য আমি এসেছি, সে প্রসংগে কোনো কথাই আপনি উত্থাপন করলেন না? আবরাহার এ প্রশ্নের জবাবে আবদুল মোত্তালেব বললেন, হে রাজা! আমি উটের মালিক, তাই আমি উটের প্রসংগ উত্থাপন করেছি। কাবার মালিক তো আমি নই। তাই কাবা রক্ষার দায়িত্বও আমার নয়, কাবা ঘরের যিনি মালিক, তিনিই তার ঘর রক্ষা করবেন।

আবরাহা বললো, আমার হাত থেকে কাবা ঘর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মোত্তালেব বললেন, এ ব্যাপারে আপনার সাথে কাবার মালিকের সাথেই বুঝাপড়া হবে। এই আলাপ আলোচনার পর আবরাহা আবদুল মোত্তালেবের উটগুলো ফেরত দেয়।

আব্দুল মোত্তালেবের দোয়া

আবদুল মোত্তালেব ফিরে এসে সবার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তুলে ধরলেন। আবদুল মোত্তালেব মক্কাবাসীকে ঘরবাড়ী ছেড়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পর্বত চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন। মক্কা নগরী থেকে রেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে আবদুল মোত্তালেব আরও কিছু সংখ্যক কোরায়শসহ কাবার দরজায় কণ্ঠলগ্ন হয়ে অশ্রু বিগলিত নয়নে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। কথিত আছে, আবদুল মোত্তালেব তখন আবেগ ভরা কণ্ঠে নিম্নোক্ত কবিতা গুচ্ছ আবৃত্তি করছিলেন,

'হে প্রভূ! বান্দা তার নিজ ঘরকে রক্ষা করে
তুমি তোমার ঘরকে রক্ষা করো।
কাল যেন তোমার ঘরের ওপর ক্রুশ ও তাদের অভিযান বিজয়ী না হয়।
তুমি যদি আমাদেরকে ও তোমার ঘরকে এমনি ছেড়ে দিতে চাও
তাহলে সেটা হবে তোমার ব্যাপার, তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারো।'

শেষ পর্যন্ত আবরাহা যখন তার সমস্ত সৈন্য ও হস্তিবাহিনী নিয়ে কাবাঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো তখন তার হাতিগুলো আকস্মিকভাবে থমকে দাড়ালো, হাতিগুলোকে সামনে আগানোর জন্যে অনেক চেষ্টা চালানো সত্তেও এ হাতিগুলো এক পাও অগ্রসর হলো না।

হাতির এ আচরণ বোখারী শরীফে বর্ণীত রসূলুল্লাহ (স.)-এর একটি হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে ওমরার উদ্দেশ্যে আল্লাহর রসূল (স.) যখন ১৪০০ সাহাবীকে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হন, তখন হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর আল্লাহর রসূলের উট আর মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ উটগুলো অবাধ্য হয়ে গেছে, ওরা মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। রসূল (স.) বললেন, উট অবাধ্য হয়নি- অবাধ্য হওয়ার জন্য ওদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি বরং হস্তিবাহিনীর বন্ধনী তাদেরকে আটকে দিয়েছে।(২)

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণীত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, মহানবী (স.) মক্কা বিজয়ের দিন দশ হাজার সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা মক্কাকে হস্তিবাহিনী থেকে হেফাযত করেছিলেন, আর তাঁর রসূলকে ও মোমেনদেরকে বিজয়ীর বেশে প্রবেশের সম্মান দান করেছেন। মক্কা নগরীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা সেদিন যেমনি অপরিহার্য ছিলো, আজও তেমনি

(২) প্রকৃত পক্ষে ঐ বছর রসূল (স.) মক্কা গিয়ে ওমরাহ করতে পারেননি,হোদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পর পরের বছর গিয়ে ওমরাহ করেছেন।-সম্পাদক

Islamiboi.tk

অপরিহার্য। তোমরা যারা আমার যবান থেকে একথাগুলো শুনছো, তারা যারা এখানে অনুপস্থিত তাদের নিকট অবশ্যই এ কথাগুলো পৌছে দিও।'

উল্লেখিত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে হস্তিবাহিনীর ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

আবরাহা বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

অতপর আল্লাহ তায়ালা শুধু হাতির পা'গুলোকেই স্তব্ধ করে দিলেন না, বরং আবরাহা সহ পুরো বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্যে পাথরসহ দলে দলে আবাবীল পাখী পাঠালেন। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী মুখে ও পায়ে পাথর নিয়ে আবরাহা বাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলো। পাথরের আঘাতে তাদের অবস্থা জন্তু জানোয়ারের চর্বিত ঘাষপাতার মতো হয়ে গেলো। তারা চর্বিতচর্বণে পরিণত হলো। যার বর্ণনা আল কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে।

আবরাহা নিজেও পাথরের আঘাত থেকে বাচতে পরলোনা। সে তার দলবল নিয়ে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ইয়েমেনের রাজধানী 'সানা'য় গিয়ে পৌঁছে, পরে সে তার হৃদয় বিদীর্ণ অবস্থায় মারা যায়।

এ ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা রয়েছে- পাখী ও পাথরের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কেও নানা ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

মোট কথা, বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এক অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক অতি প্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হস্তিবাহিনীর ধ্বংস সাধন করেন। কেউ কেউ বলেন, পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে এক ধরনের জটিল চর্ম রোগের সৃষ্টি হয়ে তাদের শরীরে পচন ধরে তারা মৃত্যুবরণ করে। ওই বছর মক্কায় ভীষণ চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। কেউ কেউ পাখী বলতে মশা মাছি, আর পাথর কুচি বলতে মশা-মাছির ছড়িয়ে দেয়া রোগ জীবাণুকে বুঝিয়েছেন। কেননা পাখি বলতে বুঝায় যা পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। মশা মাছিও পাখা ছড়িয়ে উড়ে বেড়ায়।

ইমাম মোহাম্মাদ আবদুহু তার লিখিত তাফসীরে লিখেছেন, আবদুল মোত্তালেবের দোয়ার পরদিন ব্যাপকভাবে চর্ম ও খুজলী-পাঁচড়া রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ইকরামা বলেন, হস্তিবাহিনীর এ ঘটনার মাধ্যমে আরব দেশে মহামারী আকারে চর্ম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইয়াকুব ইবনে ওৎবা বর্ণনা করেছেন, এই ঘটনার বছরেই আরব দেশে চর্মরোগ, খুজলী-পাঁচড়া মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করে। সে এমন ধরনের জটিল ও কষ্টদায়ক চর্ম রোগ, যাতে প্রথম এক ধরনের খুজলীর মতো ওঠে, পরে তা পচে গলে চামড়া ঝরে পড়তে থাকে, তার পর খসে পড়া অংশ থেকে রক্ত পুঁজ নির্গত হতে থাকে এবং রুগ্ন ব্যক্তির দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও দুর্গন্ধময় হয়ে যায় আর তিলে তিলে যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এমনি ভাবে পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে আবরাহা ও তার সেনাবাহিনীর দেহে পচন ধরে। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যাওয়ার সময় অনেকেই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করে। আবরাহা ক্ষতবিক্ষত দেহে 'সানায়' উপস্থিত হওয়ার পর মারা যায়। অবশ্য এ ব্যাপারে অধিকাংশের মতে এটিই বিশুদ্ধ মত যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী দ্বারা নিক্ষিপ্ত পাথরকুচি দেহে পড়ার সাথে সাথে সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং বাতাসের মাধ্যমে বিষাক্ত জীবাণুর সংমিশ্রণে আহত ব্যক্তি বিষক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে।

কারো কারো মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এ মর্মও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এ পাখীকুল মশা, মাছিও হতে পারে, যারা বিভিন্ন রোগ-জীবাণু বহন করে ঘুরে বেড়ায়। এ সকল

Islamiboi.tk

জীবাণু পাকা মাটির সাথে মিশ্রিত ছিলো আর ছোট ছোট পাখীর দল মাটির ক্ষুদ্র কণা জীবাণুসহ হস্তিবাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করে। পাখিদের নিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরা থেকে বায়ুমন্ডলীয় প্রবাহের সাথে মানব দেহের লোমকুপে প্রবেশ করে এক মারাত্মক ধরনের ক্ষত ও চর্ম রোগের সৃষ্টি করে। তখন পচন ধরা সেই দেহগুলো ক্ষতবিক্ষত হয় এবং পুঁজ ও রক্ত নির্গত হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা যায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ ক্ষুদ্র প্রাণীকুল যুগে যুগে আল্লাহর শক্তিশালী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করে আসছে। খোদাদ্রোহীদের বিনাশ সাধনে আজও এদের তৎপর হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহান কুদরতে ক্ষুদ্র পাখীদের দ্বারা শত্রুকে বিনাশ সাধন করতে পারেন, 'আসহাবে ফীল'-এর ঘটনা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ ঘটনার তাৎপর্য এও হতে পারে, পর্বত চূড়া থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী এসে পাথরকুচি নিক্ষেপের ফলে তাদের ধ্বংস সাধিত হয়। আল্লাহর সৈনিক তো সবাই হতে পারে। সৃষ্টির প্রতিটি পরতে পরতে তাঁরই অস্তিত্বের নিদর্শন বিরাজমান। প্রকৃতির জগতের প্রতিটি অণু-পরামাণু সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ শুধু একজন। সমগ্র সৃষ্টিতে এমন কোনো শক্তিও নেই যা আল্লাহর শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। বিদ্রোহী আবরাহা তার সকল শক্তি নিয়ে আল্লাহর ঘর ধ্বংস করতে এলে আল্লাহ তায়ালা পাথরকুচিসহ ক্ষুদ্র পাখি প্রেরণ করে আবরাহা ও তার দলবলকে মক্কা নগরীতে প্রবেশের আগেই ধ্বংস করে দিলেন।

এ ছিলো আল্লাহর এক বড়ো ধরনের অনুগ্রহ, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাঁর শেষ নবী (স.) ও তাঁর ঘরের ও হেরেমের মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি সে মুহূর্তে তাঁর ঘরের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ না করতেন, তাহলে আবরাহার হস্তিবাহিনী মক্কাবাসীসহ বায়তুল্লাহকে ধ্বংস করে দিতো। পুরো ঘটনার এ তাফসীরকেই আমরা নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ তাফসীর হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। এছাড়া অপরাপর ব্যাখ্যাকে নানাবিধ সুনির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করা ও তার বিশুদ্ধতাকে মেনে নেয়া যায় না, যদিও বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সর্বাদিক বিশাল বপুর অধিকারী হাতিকে আল্লাহর ক্ষুদ্র পক্ষীকুল ও পাথরকুচি দ্বারা ধ্বংস সাধনের ব্যাপারটিও সত্যিই বড় অদ্ভুত ও বিস্ময়কর!

আমরা এর কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না যা মোহাম্মদ আবদুহু তার তাফসীরে পার্থীব চক্ষু, চোখ ও পায়ের মাটির সাথে জীবাণু ছড়িয়ে চর্ম রোগের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমে হস্তিবাহিনীর ধ্বংস হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ ইকরামার রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়েছে– ছোট ছোট পাথর নিক্ষেপ হাতি ও আরোহীদের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে এবং তাদের দেহ চর্বিত চর্বনের মতো ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেছে এবং সূরার শেষ আয়াতে যাকে 'কা-আসফিম মা'কুল' বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো চর্বিত চর্বণের মতো হয়ে যাওয়া। এ পন্থায়ও আল্লাহর কুদরতের উপলব্ধি আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা খুবই কঠিন।

আল্লাহ তায়ালা যে কোনো পদ্ধতিতে তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষের পরিচিত পন্থায় উন্মুক্তভাবেই যদি কোনো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে চান, ধ্বংস করতে পারেন। অথবা মানুষের অপরিচিত অকল্পনীয় ও অদৃশ্যভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে পারেন। তিনি তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তিনি কোনো নিয়মের অধীন নন, বরং তাঁর গৃহীত পন্থাই হলো আসল নিয়ম।

Islamiboi.tk

আল্লাহ তায়ালার নিয়ম তো তাই, যা তিনি করেন। আল্লাহর গৃহীত পন্থা, মানুষের চির পরিচিত হওয়া, মানুষের শক্তি-সামর্থ ও অনুভূত-ও বোধগম্য হওয়া মোটেই জরুরী নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি চিরাচরিত পরিচিত পদ্ধতির বিপরীত অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতিক পন্থায়ও কোনো কিছু করেন, তবে তাকেই আল্লাহর গৃহীত পন্থা ও পদ্ধতি হিসাবে মেনে নিতে হবে। যারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে না, অথবা যারা বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে এ ঘটনার নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে চায় তাদের কারও মতামতকে আমরা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারি না।

কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ওহী দ্বারা ঘটনার বিস্ময়তা ও অলৌকিকত্ব প্রমাণিত হয়। অথচ তা মানুষের সমাজে প্রচলিত পরিচিত সাধারণ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষের সমাজে প্রচলিত, পরিচিত নিয়ম ও ধারণা বহির্ভূত হলেই যে তা আল্লাহর নিয়ম ও সামর্থের বাইরে হবে তা নয়। সূর্যের প্রতিনিয়ত উদয়াস্ত, মানবদেহের অভ্যন্তর থেকে জীবিত মানব শিশুর প্রসব, এ সকল ঘটনাও তো মানুষের নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা বহির্ভূত, অথচ তা মানুষের দৃষ্টিতে চির পরিচিত ও সব সময় তা ঘটছে। তাই আল্লাহ তায়ালা যদি ক্ষুদ্র পাখী ও পাথরকণা দ্বারা কোনো শক্তিধর শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত ও পর্যদুস্ত করেন, তবে মহা শক্তিমান আল্লাহর জন্য তা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি যদি ক্ষুদ্র পাখি ও পাথরকুচি দ্বারা কোনো বাহিনীকে মহামারীর মতো ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত করে ধ্বংস সাধন করেন, এটি তাঁর জন্য খুবই সহজতর। তিনি নির্দিষ্ট সময় বিস্ময়কর ঘটনার মাধ্যমে মানব সমাজে সাধারণ প্রচলিত নিয়মের বিপরীত পন্থায় তাঁর ঘরের সংরক্ষণ ও প্রতিরোধকল্পে অলৌকিক পদ্ধতিতে যদি পাখী ও পাথরকুচি দ্বারা শত্রু বাহিনীর দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে থাকেন, তবে তা আল্লাহর গৃহীত সফল পদক্ষেপ এবং তাঁ তার জন্য সহজ। এসবই তাঁর অসীম কুদরতের প্রমাণ বহন করে।

ঘটনার তাৎপর্য

এ ঘটনাকে আমরা যদি অলৌকিকত্বের কারণে গ্রহণ করতে ইতস্তত করি এবং পাখি ও পাথরকুচির আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে নানা ধরনের অভিমত পোষণ করি তবে এর পূর্বেও তো আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের শত্রুদেরকে ও বিভিন্ন নবীদের দাওয়াত অস্বীকার করার কারণে অনেক অস্ত্রদায়কে অলৌকিক পন্থায় ধ্বংস সাধন করার ঘটনাবলির অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই কালামে পাকের মধ্যে। আমরা সে সকল ঘটনাকে কোন দৃষ্টিতে গ্রহণ করবো? প্রকৃত মানবীয় শক্তি ও সামর্থের দৃষ্টিতে যা সসীম মানুষের শক্তি ও সামর্থ বহির্ভূত বলে অনুভূত হয়, অসীম ক্ষমতাবান আল্লাহর পক্ষে তা খুবই স্বাভাবিক ও সহজতর।

আমরা অত্যন্ত সহজভাবেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ঘরের হেফাযতের লক্ষে মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল সংরক্ষণের জন্য তাঁর অসীম কুদরতের মাধ্যমে মানবীয় দৃষ্টিতে অলৌকিক পদ্ধতিতে অভিযানকারীদেরকে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর অসীম ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত ও নবুওতের অস্বীকারকারী কোরায়শ সম্প্রদায়কে এ ঘটনা থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের ইংগিত প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের বিরোধীদের সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে অনায়াসে ব্যর্থ ও পর্যদুস্ত করে দিতে সক্ষম। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো বড়ো ধরনের প্রস্তুতি ও শক্তিশালী কোনো মাধ্যম ও উপায় উপকরণের প্রয়োজন নেই। সকল যুগের মানুষের সামনে তাঁর কালজয়ী অসীম কুদরতের দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থাপন করেছেন।

Islamiboi.tk

রসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওতের দাওয়াতের সূচনালগ্নেই কোরায়শদের চোখে আংগুল দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, কি বিস্ময়কর ও অকল্পনীয়ভাবে তিনি তাঁর দ্বীনের ও তাঁর ঘরের হেফাযতের জন্য বিরোধী ও চক্রান্তকারী শক্তিকে কতো সামান্য ও ক্ষুদ্র শক্তির মাধ্যমে চিরতরে পরাস্ত করে দিতে পারেন, পরাজিত, চূর্ণবিচূর্ণ, ক্ষতবিক্ষত, নিশ্চিহ্ন ও নাস্তানাবুদ করে দিতে পারেন। তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য কোনো পরিচিত পদ্ধতি ও পন্থা গ্রহণ করা তাঁর জন্য জরুরী নয়। তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি এক ও একক শক্তিমান।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সূরা ফীলের সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে শায়খ আবদুহুর ব্যাখ্যাকে কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারি না। বিশেষ করে, মহামারী আকারে মাটির সাথে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ফলে চর্মরোগ সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা হয় তবে কোরআনে হাকীমে বর্ণীত পাখীদের বয়ে আনা পাথরকুচির আঘাতে সেনাবাহিনীর দেহ ক্ষতবিক্ষত, চূর্ণবিচূর্ণ, হৃদয় দীর্ণবিদীর্ণ ও চর্বিত চর্বনে পরিণত হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনাকে গ্রহণ করা যায় না। অথচ কোরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে– 'কা-আসফিম মা'কুল'। এ আয়াতে তাদের দেহ খন্ড-বিখন্ড চূর্ণ বিচূর্ণ ও চর্বিত চর্বণের পরিণত কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণীত হয়েছে।

ইকরামার বর্ণনায় সে বছর প্রথম বারের মতো মক্কায় চর্মরোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট নয়। সূরা 'ফীলে' বর্ণীত আয়াতে আবরাহা ও তার সেনাদলের মধ্যে চর্মরোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার কথাও পরিস্কারভাবে বলা হয়নি। এমন কি তৎকালীন সময়ে আরবে চর্মরোগে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটি ঐতিহাসিক বর্ণনায়ও সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। শায়খ আবদুহু বিষয়টি বৈষয়িক বিশ্লেষণ ও প্রচলিত নিয়মের বিপরীত হওয়ার কারণেই কিছুটা হীনমন্যতাপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহু যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন সে প্রতিষ্ঠানটি তথাকথিত আধুনিক প্রগতিবাদীদের বিকৃত চিন্তা থেকে মুক্ত ছিলো না। সে প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত যুক্তিবাদকে প্রাধান্য দেয়া হতো। তৎকালীন সময়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বিকৃত চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিলো। কোরআনে কারীমের সব কিছুকে যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করার মানসিকতা ছিলো এই প্রতিষ্ঠানের সাথেজড়িত ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট। বুদ্ধি ও যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে না হলেই কোরআনের আয়াতসমূহকে ইহুদীদের বানোয়াট গল্প কাহিনীর প্রলেপ ছড়িয়ে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের বানোয়াট ও বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের প্রবণতা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো। তৎকালীন সময়ে হাদীস অস্বীকার করার প্রবণতাও কিছু লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আল কোরআনকে বৈষয়িক দর্শন ও তথাকথিত যুক্তির আলোকে ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সমকালীন বিজয়ী সমাজ দর্শন ও প্রকৃতি দর্শনের ভিত্তিতে তারা কোরআনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। তাদের চিন্তা স্থুলদৃষ্টি ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইসরাইলী ও খৃষ্টীয় চিন্তাধারা দ্বারা সংক্রামিত হয়।

প্রত্যেক ব্যাপারে জড়বাদী ব্যাখ্যার মননশীলতার কারণে, শায়খ আবদুহু ও তার দু'জন সেরা ছাত্র শায়খ রশীদ রেজা ও শায়খ আবদুল কাদের মাগরেবী অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক অতি প্রাকৃতিক স্থুলবুদ্ধি ও জড় দর্শনের ইন্দ্রিয়াতীত অদৃশ্যমান ঘটনাসমূহকে অস্বীকার অথবা বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

Islamiboi.tk

আল কোরআনের ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাদের এ আত্মরক্ষামূলক মানসিকতা গড়ে ওঠে, আর এ কারণেই উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত চিন্তাবিদরা ইসলামের নবতর ব্যাখ্যা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এমনিভাবে তারা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা সংশ্লিষ্ট মূল বক্তব্যের ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে উপলব্ধি না করা গেলেও কোরআনের বর্ণীত বহু অলৌকিক ঘটনা আল্লাহর অসীম কুদরত ও সর্বশক্তিমান সত্তারই প্রমাণ উপস্থাপন করে।

মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

এ সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে খুবই প্রজ্ঞা ও সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। বিশেষ করে তথাকথিত আধুনিক চিন্তাধারা থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারেও গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এখানে এটি অত্যন্ত নিখুত, নির্ভুল ও নিরাপদ পদ্ধতিতে আল কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের দৃষ্টিভংগিই প্রমাণিত হয়। এ বিস্ময়কর ও অভিনব পদ্ধতিতে আল্লাহর ঘরের হেফাযত ও অলৌকিকভাবে শত্রু নিপাতের ঘটনাকে উপস্থাপন ও প্রমাণ করাই হচ্ছে আলোচ্য সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই কোরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্যকে প্রচলিত বুদ্ধি-বিবেক ও স্থূলদৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে কোনো বিষয় বুঝে না আসলে তা অস্বীকার করা কিছুতেই আমাদের জন্য বৈধ ও সংগত হতে পারে না। আল্লাহর গৃহীত কার্যক্রম ও পদক্ষেপকে সবসময়ই সাধারণ নিয়মের নিরিখে বিচার ও বিশ্লেষণ করা যায় না। আর কোরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য নয়, বরং আমাদের বুদ্ধি-বিবেক, যোগ্যতা, প্রতিভা ও সাধনাকে আল্লাহ প্রদত্ত ভাষ্যকে স্বপ্রমাণিত করার জন্যই নিয়োগ ও ব্যয় করা উচিত। এ পদ্ধতিতে আল্লাহর প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ও আমাদের ঈমানী শক্তি আরও মযবুত ও বৃদ্ধি পেতে পারে। আমাদের চিন্তা ও ভাষা, আমাদের অনুভূতি ও প্রজ্ঞাকে সামষ্টিকভাবে আল্লাহর ভাষ্যকে প্রমাণিত করার জন্য আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থূলবুদ্ধি, যুক্তি, আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে আমাদের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে গ্রহণ না করে ঈমান ও একীনের বুনিয়াদেই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া অপরিহার্য। আল কোরআনের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ভাষ্যের আলোকেই বিশ্ব প্রকৃতির ঘটনাসমূহ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত ঘটনা, মানবিক চিন্তা ও মূল্যবোধ, স্থূল বুদ্ধির পরিবর্তে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে কোরআন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান দ্বারা আল কোরআন তথা অসীম কুদরতময় আল্লাহ তায়ালার ভাষ্যকে বিচার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ করার মানসিকতা কখনও গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিসংগত হতে পারে না। কেননা মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি খুবই সীমাবদ্ধ ও মানুষের বিশ্লেষণ শক্তি ও অভিজ্ঞতা একান্ত সসীম।

মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক যদিও জ্ঞান-সাধনা, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ও ভূমিকার অধিকারী এবং অনেক ক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধি-চিন্তা ও গবেষণা খুবই বিস্ময়কর অবদান রাখে, তথাপি প্রকৃত বিশ্লেষণ, তথ্যানুসন্ধান ও সত্য আবিস্কারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রেও মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান বারংবার ভুলের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে থাকে। মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক প্রসূত অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হতে পারে। কেননা মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞান খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আল্লাহর অসীম জ্ঞানের সাথে মানবীয় জ্ঞানের কোনো প্রকার তুলনা বা উপমাই হতে পারে না।

Islamiboi.tk

আল কোরআনের প্রদত্ত জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত সে অসীম প্রজ্ঞাময় সত্ত্বার সাথে সম্পৃক্ত, তাই মানুষের জ্ঞান পিপাসা সে অসীম সত্ত্বার প্রস্রবণ থেকে নিসৃত স্বচ্ছ জ্ঞান সুধা দ্বারা মিটতে পারে। পিপাসা কাতর মানুষ একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত আল কোরআনের আবে হায়াতের পেয়ালা পান করেই অতৃপ্ত হৃদয়ের সকল ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা নিবারণ করতে পারে। তাই কোরআনে উপস্থাপিত কোনো ঘটনা, তথ্য ও তত্ত্বকে মানুষের স্থুল-বুদ্ধি বিবেকের সাথে সংঘাত ও সংঘর্ষশীল মনে করে তাকে অস্বীকার করা বা তার অপব্যাখ্যা করা আল কোরআনের প্রতি বিশ্বাসের দাবীদার কোনো মানুষের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত, কোনো মোমেনেরই এ অধিকার নেই। অথচ স্থুল বুদ্ধি বিবেকের পর্যালোচনায় আল কোরআনের উপস্থাপিত অনেক ঘটনা ও ভাষ্যকে সংঘাত ও সংঘর্ষশীল মনে করে উপরোল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা প্রদানের অপপ্রয়াস চালিয়েছেন।

তাদের এ সকল ব্যাখ্যাকে আমি তাদের ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তি ও বিকৃত চিন্তার ফলশ্রুতি কিনা সে সম্পর্কে আমি মন্তব্য করবোনা, কিন্তু অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও এসকল ক্ষেত্রে তারা মানুষের বুদ্ধি বিবেককে আল কোরআনের ওপর প্রাধান্য প্রদান করেছেন, যুক্তি ও বুদ্ধিকে কোরআনের নিয়ন্ত্রক শক্তির আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

আমরা কোনো মতেই আল কোরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও ভাষ্যের পরিপন্থী এ ধরনের বুদ্ধি ও যুক্তির আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে গ্রহণ করতে পারি না। আল কোরআনের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন বক্তব্য ও ভাষ্যের পরিপন্থী ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা মোমেনের জন্যে অচিন্তনীয় ও অকল্পনীয়। আমাদের প্রত্যয়দীপ্ত সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা কখনো এ ধরনের অপব্যাখ্যাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে না। এ ধরনের প্রবণতাকে প্রশ্রয় প্রদান করা মুসলিম জাতিসত্ত্বার অবলুপ্তি ও ইসলামী জীবনবোধ ও চেতনার অপমৃত্যুরই নামান্তর। এ ধরনের মন-মানসিকতা, চিন্তা ও কল্পনা প্রকৃতপক্ষে আল কোরআনের পেশকৃত সত্য তথ্য ও ঘটনারাজিকে অস্বীকার করার শামিল।

আসুন এখন আমরা এ দীর্ঘ আলোচনা পরিহার করে সূরা আল ফীলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং প্রকৃত ঘটনার প্রতি আলোকপাত করি।